Vol. 58 | No. 3 | 2023

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

নজরুল-প্রতিভা: ফার্সি কাব্যানুবাদের প্রেক্ষাপটে

Volume	58
Issue	3
Year	2023
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Hosne Ara
Published online	June 1, 2023
DOI	10.62328/sp.v58i3.4
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v58i3.4
Pages	৫৩-৬৮
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

নজরুল-প্রতিভা: ফার্সি কাব্যানুবাদের প্রেক্ষাপটে

Check for updates

হোসনে আরা

সাহিত্য পত্রিকা

Shahitto Potrika
eISSN 3006-886X
ISSN 0558-1583
Volume 58
Number 3

সাহিত্য পত্রিকা (২০২৩) ৫৮ (৩): ৫৩-৬৮
DOI 10.62328/sp.v58i3.4

নজরুল-প্রতিভা: ফার্সি কাব্যানুবাদের প্রেক্ষাপটে

হোসনে আরা*

সারসংক্ষেপ: নজরুল-সাহিত্যে ফার্সি কবি ও কবিতার প্রভাব অনন্য। কবি-জীবনের সূচনালগ্নে নজরুল ফার্সি-সাহিত্য পাঠ করেছেন নিবিড়ভাবে এবং অনুবাদও করেছেন বিচ্ছিন্নভাবে কিছু ফার্সি কবিতা। পরবর্তীসময়ে নজরুল যখন কবি-গীতিকার হিসেবে জনপ্রিয়তার তুঙ্গে অবস্থান করছেন, তখন অনুবাদ করেছেন ফার্সি ভাষার কবি হাফিজ ও ওমর খৈয়ামের রুবাইয়াৎ। আলোচ্য প্রবন্ধে নজরুলের এই কাব্যদ্বয় অনুবাদের প্রেক্ষাপটে নজরুল-মানস চিহ্নিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। ফার্সি কাব্যানুবাদের সূত্রে নজরুলের ঔপনিবেশিক শাসন বিরোধিতা, স্বদেশ-স্বভাষার প্রতি অনুরাগ প্রকাশিত হয়েছে। তার স্বরূপ-সন্ধান এ প্রবন্ধের লক্ষ্য।

নজরুল কখনোই মসনদের কবি ছিলেন না বরং তার বিপরীত প্রান্তে ছিল তাঁর অবস্থান। সমগ্রজীবন তিনি অপরায়িত জীবন যাপন করেছেন এবং সমাজের অপর শ্রেণির হয়েই কথা বলেছেন। তাই আদর্শগত কারণেই তিনি সমকালীন শাসকগোষ্ঠীর ভাষা ও সাহিত্যকে সচেতনভাবে কিছুটা এড়িয়ে গেছেন। যদিও অনুবাদ করেছেন তিনি শেলী ও হুইটম্যানের কবিতা, তবু তাঁর কবি-মানসে ইংরেজি সাহিত্য ও কবিদের প্রভাব ন্যূন।

নজরুল-চিত্তে যে দুজন ভিনদেশি বা ভিনভাষার কবির প্রভাব সর্বাধিক, তাঁরা নিঃসন্দেহে পারস্যের[১] কবি ওমর খৈয়াম এবং হাফিজ। ভারতীয় এবং পারসিক বা অধুনা ইরানীয়দের মধ্যকার সম্পর্কখুবই প্রাচীন এবং অন্তরঙ্গ – উভয়েই একই আর্যগোষ্ঠীর দুই শাখা। তাই চিরদিনই ভারত ও পারস্যের আত্মা সমসূত্রে গ্রথিত (এনামুল, ১৯৯১: ৯৪) । নজরুল-জীবনে পারস্যের প্রভাবের পেছনে পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক বহুবিধ কারণ বিদ্যমান। নজরুল পূর্বপুরুষ মহম্মদ ইসলাম ত্রয়োদশ শতকে সুদূর বাগদাদ থেকে এসেছিলেন এ ভূখণ্ডে (মলয়, ২০১৬ : ১৬৮); সম্ভবত তৎপরবর্তী বেশ কয়েক পুরুষ বাস করেছেন বিহারে; এবং কাজী পরিবার প্রধানত আদালত-কেন্দ্রিক জীবিকা নির্বাহ করেছেন। তাই আদালতের ভাষা ফার্সিতে[২] তাদের দখল ছিল এটা ধরে নেয়া অসঙ্গত হবে না বোধ করি। নজরুলের পিতৃব্য বজলে করিম, লেটো দলের অধিকারী, নজরুলের সঙ্গে যার সম্পর্ক ছিল আন্তরিক ঘনিষ্ঠতার; নজরুল নিজেও যার দলে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন স্বেচ্ছায়; ফার্সি ভাষায় তাঁর (বজলে করিম) দখল ছিল বলেই নজরুল-জীবনীকারদের ধারণা।[৩] অতএব পারিবারিক পরিমণ্ডলেই নজরুলের ফার্সি শেখার সূত্রপাত। তখনকার গ্রাম্য মক্তবেও আরবির সঙ্গে সঙ্গে ফারসির প্রাথমিক শিক্ষা হওয়া ছিল খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। পরবর্তীসময়ে স্কুল-জীবনে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে কিশোর নজরুলের ফারসি শেখার সুযোগ ঘটে রানিগঞ্জ সিয়ারসোল হাই স্কুলে পাঠকালে হাফিজ নুরুন্নবীর কাছে থেকে (অরুণকুমার, ২০১৯: ২৫)। স্কুলজীবন অসমাপ্ত রেখেই তিনি যখন যোগ দিলেন বাঙালি

---

* অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

পল্টনে, করাচি সেনানিবাসে অবস্থানকালে একজন পাঞ্জাবি মৌলবি সাহেবের কাছে শেখেন ফারসি ভাষা, যা তাঁর ফারসি সাহিত্য পাঠের সহায়ক হয়। সৈয়দ মুজতবা আলী অবশ্য সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন যে, বাল্যকালে সম্ভবত ফারসি শেখার সুযোগ ঘটেনি নজরুলের এবং করাচি সেনানিবাসে মৌলবির কাছেই ফারসি শেখার সূত্রপাত। তাঁর এ ধারণাকে শক্ত ভিত্তি দিয়েছিল *রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ* গ্রন্থের মুখবন্ধে দেওয়া নজরুলের নিজের বক্তব্য:

> আমি তখন স্কুল পালিয়ে যুদ্ধে গেছি। সে আজ ইংরেজি ১৯১৭ সালের কথা সেইখানে প্রথম আমার হাফিজের সাথে পরিচয়।
> আমাদের বাঙালি পল্টনে একজন পাঞ্জাবি মৌলবী সাহেব থাকতেন। একদিন তিনি দীওয়ান-ই-হাফিজ থেকে কতকগুলি কবিতা আবৃত্তি করে শোনান। শুনে আমি এমনি মুগ্ধ হয়ে যাই যে, সেইদিন থেকেই তাঁর কাছে ফার্সি ভাষা শিখতে আরম্ভ করি। (কাজী নজরুল, ১৯৯৬/২: ১৫)

নজরুলের এ বক্তব্যে মনে হতে পারে যে, এর আগে তিনি এই ভাষা শেখেননি বা এর চর্চা করেননি। কিন্তু পরের লাইনটি ব্যক্ত করে ভিন্ন ইঙ্গিত – 'তাঁরই কাছে ক্রমে ফার্সি কবিদের প্রায় সমস্ত বিখ্যাত কাব্যই পড়ে ফেলি' (কাজী নজরুল, ১৯৯৬/২: ১৫)।

শেষোক্ত কথাগুলো আমাদের এই প্রতীতি দেয় যে, মৌলবির কাছে থেকে শেখা ফার্সি সম্ভবত ফার্সি কাব্যভাষা। প্রত্যেক ভাষায় কথ্য ভাষা বা প্রায়োগিক ভাষার সঙ্গে সাহিত্যিক বা কাব্যভাষার দুস্তর ব্যবধান রয়েছে, ফার্সির ক্ষেত্রেও তা ব্যতিক্রম নয়। নজরুল ইতোপূর্বে ফার্সি ভাষা শিখলেও তা ছিল প্রায়োগিক ভাষা, কাব্যভাষার সঙ্গে হয়তো তাঁর সংযোগ ঘটেনি।

করাচি সেনানিবাসে অবস্থানকালেই নজরুলের সাহিত্যিক জীবনের সূচনা এবং এই সূচনালগ্নে ফার্সি সাহিত্যের প্রভাবশালী কবি হাফিজের প্রভাব নজরুলের কবিমানসে প্রভাব ফেলেছিল দারুণভাবে। *বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য* পত্রিকার ১৩২৬ শ্রাবণ-আশ্বিন সংখ্যায় নজরুলের প্রথম (মুদ্রিত) কবিতা 'মুক্তি' প্রকাশিত হয় এবং একই বছর পৌষ মাসে *প্রবাসী* পত্রিকায় নজরুল কর্তৃক হাফিজের একটি দীওয়ানের অনূদিতরূপ 'আশায়' প্রকাশিত হয়। এ কবিতাটি ছাপানোয় সাহায্য করার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়কে (সহকারী সম্পাদক, *সবুজপত্র*) লেখা এক চিঠিতে নজরুল তাঁর হাফিজ-মুগ্ধতার পরিচয় দিয়েছেন সঙ্কোচের বিহ্বলতা কাটিয়ে:

> পারসিক কবি হাফিজের মধ্যে বাঙলার সবুজ দূর্বা ও জুঁই ফুলের সুবাস আর প্রিয়ার চূর্ণ কুন্তলের যে মৃদু গন্ধের সন্ধান আমি পেয়েছি, সে-সবই ত খাঁটি বাঙলার কথা, বাঙালী জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, আনন্দরসের পরিপূর্ণ সমাহার। (উদ্ধৃত, সুশীল, ১৩৯৫: ১৩)

১৩২৭ সালের আষাঢ় মাসে *মোসলেম ভারত* পত্রিকায় নজরুল কর্তৃক হাফিজের আরেকটি দীওয়ানের অনূদিতরূপ 'বাদলপ্রাতের শরাব' প্রকাশিত হয়। এসময় একাধারে হাফিজের ত্রিশ-পঁয়ত্রিশটি দীওয়ান বা গজল অনুবাদ করেন কবি । কিন্তু এরপর কিছুটা একঘেয়েমিতে

আক্রান্ত হয়ে, কিছুটা ধৈর্য হারিয়ে হাফিজ অনুবাদের কাজ বন্ধ করে দেন।

দশ বছরের দীর্ঘ বিরতির পর ১৩৩৭ সালের আষাঢ় মাসে প্রকাশিত হয় নজরুল অনূদিত *রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ।* পুত্র বুলবুলের মৃত্যু-শিয়রে বসে কবি এ অনুবাদের কাজ করেছেন কিন্তু কাব্যানুবাদের সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে কবিপুত্রের জীবনাবসান ঘটেছে। এ অসহনীয় শোককে ধারণ করে কবি এ কাব্যটি উৎসর্গ করেছেন বুলবুলকে এবং কাব্যের মুখবন্ধে এ মৃত্যুকে ত্যাগ বলে অভিহিত করেছেন:

> যেদিন অনুবাদ শেষ হল, সেদিন আমার খোকা বুলবুল চলে গেছে।
> আমার জীবনের যে ছিল প্রিয়তম, যা ছিল শ্রেয়তম তারই নজরানা দিয়ে শিরাজের বুলবুল কবিকে বাঙলায় আমন্ত্রণ করে আনলাম।
> বাঙলার শাসনকর্তা গিয়াসুদ্দিনের আমন্ত্রণকে ইরানের কবি-সম্রাট হাফিজ উপেক্ষা করেছিলেন। আমার আহ্বান উপেক্ষিত হয়নি। যে পথ দিয়ে আমার পুত্রের 'জানাজা' (শবযান) চলে গেল, সেই পথ দিয়ে আমার বন্ধু, আমার প্রিয়তম ইরানী কবি আমার দ্বারে এলেন। আমার চোখের জলে তাঁর চরণ অভিষিক্ত হল। (কাজী নজরুল, ১৯৯৬/২: ১৫)

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, হাফিজের গুণমুগ্ধ সুলতান গিয়াসুদ্দিন আজম শাহ কবিকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন বাংলায় পরম সমাদরে। কবিও তাঁর আমন্ত্রণ উপেক্ষা করেননি, সমুদ্রপথে যাত্রা করেছিলেন ভারতের উদ্দেশ্যে কিন্তু পথিমধ্যে প্রবল ঝড়-তুফান বাধ সাধে তাঁর এই সদিচ্ছায়। সমুদ্র-ভ্রমণের অভিজ্ঞতাহীন হাফিজ প্রাণভয়ে ভীত হন এবং তাঁর মনে হয় যে, স্রষ্টার সম্ভবত অনুমোদন নেই এই যাত্রায়। শেষ জীবনেও তিনি ভারত-ভ্রমণে ইচ্ছুক হয়েছেন কিন্তু শরীরের অশক্ত অবস্থা সেই পরিকল্পনাকে অনুমোদন দেয়নি।

রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ কাব্যের মুখবন্ধে নজরুল জানিয়েছেন যে তিনি মূল ফার্সি থেকেই এর অনুবাদ করেছেন। কবি মোট পঁচাত্তরটি রুবাই অনুবাদগ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করেন এবং দুটি রুবাই অনুবাদ করে মুখবন্ধে উল্লেখ করেন। এ দুই রুবাই হাফিজের রচিত নয় বলেই কবির মনে হয়েছে। এছাড়া আটত্রিশ নম্বর রুবাইও তাঁর কাছে প্রক্ষিপ্ত বলে মনে হয়েছে। এ প্রসঙ্গে ফার্সি সাহিত্যের দুজন বিশ্বখ্যাত সমালোচক ব্রাউন সাহেব এবং মৌলানা শিবলী নৌমানীকে উল্লেখ করে জানিয়েছেন, হাফিজ রচিত রুবাইয়াতের সংখ্যা নিয়ে তাঁদের ধারণা অভ্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। অন্যের মতকে অবনতচিত্তে মেনে নেয়া এবং নিজের ভুল নিজে স্বীকার করার মাধ্যমে নজরুল যে স্বচ্ছতা প্রকাশ করলেন, তা তাঁর ব্যক্তিচরিত্রকেই মাধুর্যমণ্ডিত করেছে।

কবিজীবনের প্রথম লগ্নে হাফিজপ্রীতি এবং হাফিজ-নদী অবগাহনের অভিজ্ঞতা নজরুলের কাব্যভাষা নির্মাণে ক্রিয়াশীল ছিল। রবীন্দ্র-বলয় ছিন্ন করে নতুন ভাব-ভাষা নির্মাণে নজরুল সমকালে বিদ্যুৎ চমকের মতোই আবির্ভূত হয়েছিলেন। কেবল শব্দ ও ছন্দ-নির্মাণ কৌশলে নয়, উপমা-চিত্রকল্প নির্মাণেও তিনি যে স্বাতন্ত্র্য সৃষ্টি করেছিলেন তাতে ফার্সি সাহিত্যের প্রভাব ছিল। আধুনিক বাংলা সাহিত্য গড়ে উঠেছিল ইউরোপীয় আদলে,

রবীন্দ্রনাথ তাকে আত্তীকরণ করে নিজস্বতা দিয়েছেন তাঁর তুলনারহিত সৃষ্টিক্ষমপ্রজ্ঞায়। ফার্সি ছয় শতক ধরে উপমহাদেশের রাজভাষা হলেও এবং আধুনিক কবিরা তাদের কবিতায় ফার্সি শব্দ ব্যবহার করলেও পরিপূর্ণভাবে আত্মস্থ করে বাংলার ভাব-ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে তাকে মিলিয়ে দেয়া একমাত্র নজরুলের মতো বিরাট প্রতিভার পক্ষেই সম্ভব ছিল।

সাহিত্যিক নজরুলের উন্মেষকালে কবি হাফিজ তাঁকে এতখানি আপ্লুত করেছিল যে, কেবল কবিতায় নয়, গল্পেও তিনি হাফিজকে এনেছেন চরিত্র হিসেবে, হাফিজের আধ্যাত্মিকতা নিয়ে প্রচলিত কাহিনি অনুসরণে রচনা করেছেন 'সালেক' নামক ছোটগল্প, *রিক্তের বেদন* গল্পগ্রন্থে যা গ্রথিত হয়েছে। চার পরিচ্ছেদের এই ছোটগল্পে কবি নয়, দরবেশরূপী হাফিজকে চিত্রিত করা হয়েছে। হাফিজ নিজেকে রিন্দা বা মুসলমান ফকির বলে ঘোষণা করেছিলেন (বরকতুল্লাহ, ১৯৯৪: ৮০)। রিন্দারা বাহ্যিক ধর্মাচারের যে সকল বিধি-নিষেধ সমাজে প্রচলিত, সেগুলো মানতেন না। হাফিজ নিজেকে রিন্দা বললেও জীবন-যাপনে উচ্ছৃঙ্খল ছিলেন না; বরং আজীবন কঠোর সাধনায় চরিত্রকে সমুন্নত রেখেছেন। তাঁর অলৌকিকতা নিয়ে বহু গল্প প্রচলিত রয়েছে। কবি জামী তাঁর *সুফীদিগের ইতিবৃত্ত* গ্রন্থে হাফিজকে 'নেছানেল গায়েব' অর্থাৎ ভবিষ্যদ্বক্তা বলে অভিহিত করেছেন (বরকতুল্লাহ, ১৯৯৪: ৮০)। 'সালেক' গল্পটি সেই ভাবধারাতেই রচিত। তবে ভাষা নিজের হলেও এ কাহিনি-রেখা হাফিজেরই এক দীওয়ান থেকে সংগৃহীত।[৪] হাফিজ কোনো সম্প্রদায় মানতেন না, কোনো সাম্প্রদায়িক নিয়মের তোয়াক্কা করতেন না। এ ভাবধারার চরম প্রকাশ তো আমরা নজরুলে পাই স্পষ্টভাবেই; 'বিদ্রোহী' কবিতায় যার প্রকাশ ঘটেছে এভাবে:

> আমি দ'লে যাই যত বন্ধন, যত নিয়ম কানুন শৃঙ্খল!
> আমি মানি না কো কোন আইন,

হাফিজের দীওয়ানে মুগ্ধ ছিলেন নজরুল, অনুবাদও করেছেন কিছু বিচ্ছিন্নভাবে, তবে সমগ্রতার দিক থেকে তিনি অবলম্বন করেছেন রুবাইয়াৎ-কে। কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন:

> তাঁর রুবাইয়াৎ বা চতুষ্পদী কবিতাগুলি পড়ে মনে হয়, এ যেন তাঁর অবসর সময় কাটানোর জন্যই লেখা। অবশ্য এতেও তাঁর সেই দর্শন, সেই প্রেম, সেই শারাব-সাকি তেমনিভাবেই জড়িয়ে আছে।
>
> এ যেন তাঁর অতল সমুদ্রের বুদ্বুদ-কণা। তবে এ ক্ষুদ্র বিম্ব হলেও এতে সারা আকাশের গ্রহ-তারার প্রতিবিম্ব প'ড়ে একে রামধনুর কণার মত রাঙিয়ে তুলেছে। হয়ত এত ছোট বলেই এ এত সুন্দর। (কাজী নজরুল, ১৯৯৬/৩: ১৫)

এ কারণেই চতুষ্পদী ফার্সি এ কবিতাগুলো কবিকে আকৃষ্ট করেছিল সর্বাধিক । ভাব-বিন্যাস ও ছন্দ নির্মাণে যে নতুনত্ব, তাকে বাংলা কাব্যে যোগ করার স্পর্ধাতেই নজরুল রুবাইয়াৎ অনুবাদ করেছেন হাফিজের এবং ওমর খৈয়ামের।

রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ অনুবাদে নজরুল মূলকে অক্ষুণ্ন রাখতে সচেষ্ট ছিলেন। মূল রুবাইয়াতের অনুসরণে তিনি ছন্দের মিল রেখেছেন ককখক। কিন্তু স্বাধীন কবিসত্তা কখনো পুরোপুরি অন্যের প্রভাবে থাকতে পারে না, ক্ষেত্রবিশেষে স্বকীয়তার স্ফুরণ ঘটবেই এবং এ অনুবাদের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। ছন্দ-নির্মাণে নজরুল মূলাভিসারী হলেও তৃতীয় পঙ্‌ক্তিকে তিনি মূল রুবাইয়ের রূপে রাখেননি; তৃতীয় পঙ্‌ক্তিকে ভেঙে দুটো করে সাজিয়েছেন এবং কোথাও কোথাও অন্ত্যমিল দিয়ে তিনি বাংলা কবিতার আমেজ নিয়ে এসেছেন। ৪১ নং রুবাইকে উদাহরণ হিসেবে নেয়া যেতে পারে এ ক্ষেত্রে:

সকল-কিছুর চেয়ে ভাল
সুরাই-যখন কাঁচা বয়েস,
প্রণয়-বেদন, মত্ততা, পাপ–
যৌবনেরি একার আয়েশ।
এই যে তামাম দুনিয়াটা-ই
বরবাদ আর খারাব রে ভাই,
মন্দ ধরায় মন্দ যা – তার
প্রমত্ততাই মানায় যে বেশ ॥ (কাজী নজরুল, ১৯৯৬/৩: ৩১)

এখানে তৃতীয় পক্তি বিভাজিত হয়ে যে অংশদ্বয়ে পরিণত হয়েছে, সেখানে অন্ত্যমিল দেখা যাচ্ছে।

হাফিজের দীওয়ান, রুবাইয়াৎ, নতুন ভাব-ভাষা-ছন্দ এগুলোই কী কেবল তরুণ কবিকে আকর্ষণ করেছিল তীব্রতা নিয়ে? নাকি নানা রং-রূপ নিয়ে প্রকৃতির সজীবতাকে শব্দের দ্যুতিতে এবং ছন্দের মাধুর্যে প্রকাশের ভঙ্গি? নাকি প্রেমোন্মত্ত হাফিজই টেনেছিল সদ্য তরুণ নজরুলকে। দীওয়ানের একমাত্র সুর প্রেমোন্মত্ততা। প্রেমের আবেশের নাম শরাব। আর যিনি ব্যক্তি হৃদয়কে প্রেম দিয়ে সিঞ্চিত করে তার নাম – সাকী। পানশালা হলো ঐশ্বরিক প্রেমের লীলা-নিকেতন। আর প্রেম যাকে ঘিরে তার নাম মানুষ। হাফিজ প্রেমকে ধর্ম বলে অভিহিত করেছেন:

নহিক হানাফী, শাফী, মালেকী, হাম্বলী,
প্রেম মম একধর্ম অন্য নাহি জানি। (বরকতুল্লাহ, ১৯৯৪: ৮০)

ইরানি কবির এ সুর যেন আমরা শুনতে পাই বৈষ্ণব পদাবলির চণ্ডীদাসের কণ্ঠে – 'শুন হে মানুষ ভাই, সবার উপর মানুষ সত্য, তাহার উপর নাই।' তারই অনুরণন শোনা যায় নজরুলের সাম্যবাদী গ্রন্থের 'মানুষ' কবিতায়: 'মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান!'

হাফিজ এবং চণ্ডীদাস দুজন ভিন্নদেশে প্রায় একই সময়ে বর্তমান ছিলেন। তাদের ভাবাদর্শেও মিল ছিল। হাফিজ সুফি মতাবলম্বী, চণ্ডীদাস বৈষ্ণব। সুফিবাদের উদ্ভব ইরানে বলেই Von Kremer ও Dozy মনে করেন। E. G. Brown-এর মতে, সেমেটিক আরব

ধর্ম ইরানের ভাবপ্রবণ আর্য মনে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল, তাই সুফিতত্ত্বে রূপ লাভ করেছে। কারো মতে, গ্রিক দর্শনের সঙ্গে পরিচয় ইরানে ভাববিপ্লব ত্বরান্বিত করেছে। সুফিদের ভাববাদে বৈদান্তিক সর্বেশ্বরবাদের প্রভাব থাকলেও বৌদ্ধ নির্বাণবাদও ফানাতত্ত্বের উন্মেষের সহায়ক হয়েছে, সেই সঙ্গে গুরুবাদও। অবশ্য তাত্ত্বিক ও মরমীয়া হলেও সুফিরা ইসলামকে ভোলেনি, কোরআনের সমর্থনকেই সম্বল করে জীবন ও ধর্মকে সমন্বিত করবার চেষ্টা করেছে। এতে দ্বৈত ও অদ্বৈতবাদের স্বীকৃতিও সম্ভব করে নিয়েছে এবং তাতেও আবার দোহাই কেড়েছে কোরআনের। ভোগ-পরিমিতিবাদের সূত্র ধরে বৈরাগ্যবাদও প্রশ্রয় পেয়েছে সূফিতত্ত্বে। (আহমদ শরীফ, ১৯৬৯: ভূমিকা খ-গ)

বৈষ্ণববাদেও দ্বৈত ও অদ্বৈতবাদের সম্পর্ককেই ভিত্তি হিসেবে দেখা হয়েছে। সুফিবাদের মতো বৈষ্ণবমতেরও মূল কথা প্রেম। দ্বাদশ শতকে পারস্যের সুফিবাদ নিয়মিতভাবে ভারতে প্রবেশ করে। উত্তর ভারতে থেকে বাংলায় সুফিবাদের প্রবেশ ও প্রসারের ফলে দেশে আকস্মিকভাবের যে ভাববন্যা সৃষ্টি হলো তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়ে ষোড়শ শতাব্দীতে এসে বাংলার ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ শ্রীচৈতন্যদেবের (১৪৮৪-১৫৩৩) আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে বাধা পেল এবং ক্রমে তা আরো স্তিমিত বা মন্দীভূত হয়ে পড়ল (এনামুল, ১৯৯১: ১০১)। বলা যেতে পারে যে, সুফিবাদের ধারাটি ক্রমে বৈষ্ণববাদের ধারায় অঙ্গীভূত হয়ে স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে ফেলল।

হাফিজের সুফিবাদ এবং চণ্ডীদাসের বৈষ্ণববাদ আধুনিককালে এসে নজরুল-মানসে সাম্যবাদে রূপ নিল এবং এদের মানব-প্রেমকে ধারণ করেই নজরুল হয়ে উঠলেন সর্বহারার কবি। তবে ভাববাদের দীক্ষার পাশাপাশি ব্যক্তিক প্রেমের সাধনাতেও হাফিজকেই গুরু মেনেছেন তিনি। হাফিজ যেমন প্রিয়ার গালের একটি তিলের জন্য সমরখন্দ-বোখারা বিলিয়ে দিতে প্রস্তুত ছিলেন, নজরুলও তেমনি একটি খোঁপার কাঁটাকে অবলম্বন করে প্রিয়া-সান্নিধ্যের সুখ পেতে চেয়েছেন। *ব্যথার দান* গল্পগ্রন্থটি নজরুল উৎসর্গ করেছিলেন তাঁর কোন এক মানসীকে:

মানসী আমার!
মাথার কাঁটা নিয়েছিলুম ব'লে
ক্ষমা করনি,
তাই বুকের কাঁটা দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত ক'রলুম। (কাজী নজরুল, ১৯৯৬/১: ৬০১)

৩২ কলেজ স্ট্রিটে নজরুলের থাকার জায়গায় যখন পুলিশের খানা-তল্লাশি হয়, তখন কোনো মেয়ের মাথার কাঁটা খুঁজে পাওয়া যায় কবির জিনিসপত্র থেকে, কবি যা সযত্নে গোপনে সংরক্ষণ করেছিলেন। এদিক দিয়েও নজরুল ও হাফিজের মনোধর্মিতার সাযুজ্যের সন্ধান মেলে।

অর্থাৎ ভাব-ভঙ্গি, কাব্য-নির্মাণ-কৌশল এবং প্রেমের ঐকান্তিকতা নানা বিষয়েই নজরুল হাফিজের প্রভাবকে স্বীকার করেছেন। হাফিজের দীওয়ান বা গজল অনুবাদে

সিদ্ধহস্ত হয়ে পরবর্তীকালে বাংলা সাহিত্যকে অফুরন্ত দিয়েছেন মৌলিক গজল, ভাবসঙ্গীত, শ্যামা-সঙ্গীত প্রভৃতি ।

প্রথম জীবনে হাফিজে বুঁদ হয়ে থাকলেও পরবর্তীসময়ে নজরুল-মানসে সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য বিস্তার করেছেন হাফিজের পূর্বসূরি আরেক পারস্য-কবি ওমর খৈয়াম(১০৪৮-১১২৩)। বৈজ্ঞানিক, গণিতবিদ, দার্শনিক ওমর কবিও বটে। ইংরেজ কবি-দার্শনিক ফিটজেরাল্ডের অনুবাদের (১৮৫৯) মাধ্যমে পুরো ইউরোপের মন জয় করে ওমর কেবল ছন্দের লালিত্য ও শব্দবিন্যাসের মাধুর্যে নয়, তাঁর অসাধারণ প্রজ্ঞাসম্পন্ন দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির জন্যও।

মধ্যযুগের ইউরোপ যখন যাজকতন্ত্র এবং ধর্মীয় অন্ধতার নাগপাশে রুদ্ধশ্বাস প্রায়, জীবনবাদী দার্শনিক-কবি ওমরের রুবাইয়াৎ তাদের মনে অনাবিল শান্তি এনে দিয়েছিল। কেননা যে-কথা তাদের মনের মধ্যে গুমরে মরছিল, ওমর তাই তাঁর রুবাইয়াতে প্রকাশ করেছেন অবলীলায়। প্রাচ্যের এই কবি পাশ্চাত্যকে মাতিয়ে দিলেও প্রাচ্যে বহুকাল অবধি ছিলেন অপরিচিত। প্রাচ্যের মানুষ তাঁকে চিনতে শুরু করে পাশ্চাত্যের মাধ্যমে। বাংলা ভাষায় ওমরের প্রবেশ ফিটজেরাল্ডের কাব্যানুবাদের মাধ্যমে। ফিটজেরাল্ড ওমরের প্রথমাবস্থায় ৭৫টি রুবাই অনুবাদ করেন এবং পরবর্তীসময়ে ১১০টি, যদিও ওমরের নামে আড়াই হাজার রুবাই প্রচলিত রয়েছে। তার মধ্যে বিশেষজ্ঞের মতে হয়তো দুশ বা আড়াইশ টিকবে ওমরের নিজের লেখা বলে । উনিশ শতকে ১৮৬০ থেকে ১৮৭০ সালের কোনো এক সময়ে রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রতিষ্ঠিত *বিবিধার্থ সংগ্রহ* পত্রিকায় প্রথম খৈয়ামের কাব্যের অনুবাদ প্রকাশিত হয়। সুকুমার সেনের মতে, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম ওমর খৈয়ামের কতগুলো রুবাই বাংলা পয়ারের ছন্দে অনুবাদ করেছিলেন। বাংলা ভাষায় ১৯১৯ সালে কান্তিচন্দ্র ঘোষের খৈয়াম-অনুবাদ প্রথম জনপ্রিয়তা লাভ করে। তিনি ৭৫টি রুবাই অনুবাদ করেছিলেন ফিটজেরাল্ডের প্রথম অনুবাদের অনুকরণে। যদিও বাংলা ভাষায় প্রায় ৭২জনের অধিক খৈয়াম অনুবাদ করেছেন, বেশির ভাগই ফিটজেরাল্ডের অনুবাদের অনুবাদ। নরেন্দ্রদেবের অনুবাদও যথেষ্ট জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। অনেকের মতে নরেন্দ্রদেব ফিটজেরাল্ডকে অবলম্বন করেননি। এ বক্তব্যে সত্যতা থাকলেও বলা যায় যে, তিনি মূল ফার্সি থেকেও অনুবাদ করেননি; বরং তিনি গ্রহণ করেছেন খৈয়ামের অন্য ইংরেজি অনুবাদ। বাংলার অনেক বিশিষ্ট কবি খৈয়ামের অনুবাদ করেছেন আংশিকভাবে। তার ভেতর সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, সৈয়দ মুজতবা আলী, সিকান্দার আবু জাফর প্রমুখের নাম উল্লেখ করা যায়।

বহু ভাষাবিদ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ফার্সি ভাষাজ্ঞানের অধিকারী হলেও *রুবাইয়্যাত-ই-উমর খৈয়াম* (১৯৪১) অনুবাদে মূল সাহায্য নিয়েছেন জার্মান পণ্ডিত এফ রোজেনের বইয়ের। তিনি ১৫১টি রুবাই নির্বাচন করেছেন তাঁর অনুবাদের জন্য। তবে শহীদুল্লাহ্ কবি ছিলেন না; তাঁর অনুবাদ একজন ভাষাবিদের অনুবাদ – ভাব-ভাষা থাকলেও কবিত্ব সেখানে ন্যূন। তবে খৈয়ামকে উপস্থাপনে তিনি ইসলামি ভাবধারাকে প্রাধান্য দিয়েছেন, মুক্ত দৃষ্টিতে তাঁকে অনুধাবন করেননি।

সিকান্দার আবু জাফর বাংলা একাডেমি থেকে রুবাইয়াৎ ওমর খৈয়াম (১৯৬৬) প্রকাশ করেছেন ফিটজেরাল্ডের প্রথম অনুবাদের ৭৫টি রুবাই অবলম্বনে। তবে অনুবাদের পাশাপাশি তিনি কিছু জরুরি আলোচনা সংযুক্ত করেছেন। বাংলা ভাষায় তিনিই প্রথম ফিটজেরাল্ডের জীবনী প্রকাশ করেন। ওমরের রুবাইতে সিরীয় আরবি ভাষার কবি আবুল আলা মা আরীর প্রভাবকে তিনিই প্রথম সামনে নিয়ে আসেন। আবুল আলা অন্ধ হলেও ছিলেন বহুভাষাবিদ ও দার্শনিক। আলার কবিতায় ক্ষোভ, যন্ত্রণা ও বিদ্রোহের সুরই ছিল মুখ্য।

মূল ফার্সি থেকে ওমরের ১৯৭টি রুবাই অনুবাদ করেন কাজী নজরুল ইসলাম। তাঁর অনূদিত ১-৩১ সংখ্যক রুবাই ১৩৪০-এর কার্তিকে, ৩২-৪৬ সংখ্যক রুবাই ১৩৪০ অগ্রহায়ণে, ৪৭-৫৯ সংখ্যক রুবাই ১৩৪০ পৌষে *মাসিক মোহাম্মদী* পত্রিকায় 'রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম' শিরোনামে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। গ্রন্থাকারে নজরুলের রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম প্রকাশিত হয় ১৩৬৬-র পৌষ অর্থাৎ ১৯৫৯-এর ডিসেম্বরে; কবি যখন নির্বাক হয়ে আছেন। গ্রন্থের ভূমিকা লেখেন সৈয়দ মুজতবা আলী 'নজরুল ইসলাম ও ওমর খৈয়াম' শিরোনামে। আবদুল কাদির সম্পাদিত *নজরুল-রচনা-সম্ভার* পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণে অন্তর্ভুক্ত হয় নজরুলের 'ওমরের কাব্য ও দর্শন' নামের প্রবন্ধটি। পরবর্তী সময়ে বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত একই সম্পাদকের নজরুল রচনাবলীর (১৯৭৭) তৃতীয় খণ্ডে *রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম*-এর ভূমিকা হিসেবে স্থান পেয়েছে। এ রচনাটি 'এই সময়কার নজরুলের গভীর রসবোধ, কাব্যচেতনা, আরবি-ফারসির জ্ঞান, মধ্যপ্রাচ্য ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ে তাঁর কৌতূহল, এই সবকিছুর অতি বাস্তব দলিল।' (অরুণকুমার, ২০১৯ : ৪৯৬)

এই রচনায় নজরুল ওমরের কাব্য-বিশ্লেষণে ছয়টি শ্রেণির সন্ধান পেয়েছেন। তন্মধ্যে 'কুফরিয়া' বা ধর্মশাস্ত্র-বিরুদ্ধ কবিতাসমূহকে শ্রেষ্ঠ কবিতা বলে অভিহিত করেছেন। স্বর্গ-নরকের অলীক কল্পনা, বাহ্যিক উপাসনার অসারতা, পাপপুণ্যের মিথ্যা ভয় ও লাভ ইত্যাদি নিয়ে লিখিত কুফরিয়া কবিতাগুলো। নজরুলের মতে, ওমরকে যে Epicurean বলে অনেকে অভিহিত করেন, তা তাঁর এই শ্রেণির কবিতার জন্য। প্রকৃতপক্ষে ওমর ভোগবাদী কবি নন, তিনি মূলত জীবনবাদী কবি। তাঁর কাব্যে শরাব-সাকির ছড়াছড়ি থাকলেও ব্যক্তিগত জীবনে তিনি মদ্যপ ছিলেন কিনা তার প্রমাণ নেই; বরং জীবনে এবং কাব্যে তাঁর আশ্চর্য সংযমের পরিচয়ই লিপিবদ্ধ রয়েছে।

নজরুলের মতে, ওমর তাঁর রুবাইয়ে শারাব বলতে আঙুরের ক্বাথের উল্লেখ করেছেন, যা পারস্যের সকল কবিরই অন্তত 'বলার জন্য বলা'র বিলাস। শারাব, সাকি, গোলাপ, বুলবুলকে বাদ দিয়ে যে কবিতা লেখা যায়, তা ইরানের কবিরা ভাবতে অক্ষম ছিলেন।

নজরুল ওমরকে উপমিত করেছেন 'মরুভূমির বুকের খর্জুরতরু' হিসেবে; যার সারা দেহে কণ্টকের জ্বালা, ঊর্ধ্বে রৌদ্রতপ্ত আকাশ, নিম্নে আতপতপ্ত বালুকা এর মধ্যে অবস্থান করেও এ বৃক্ষ সুমিষ্ট রসের নহর বইয়ে দেয়। ওমর তেমনি শত লাঞ্ছনা ভোগ করেও কাব্যরসে সিক্ত করেছেন ধরার অন্তর। সমকালে এ কবির যথার্থ মূল্যায়ন তো

হয়ইনি, উল্টো 'কাফের' অভিধায় অভিষিক্ত হতে হয়েছে তাঁকে। তিনি যুগের থেকে অনেক এগিয়ে ছিলেন বলেই সমকাল তাঁকে ভুল বুঝেছে। নজরুলের ভাষায়:

> ওমরকে লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়েছিল, তা বুঝি তাঁর ঐ হাজার বছর আগে জন্মাবার জন্যই। আজকাল পৃথিবীর কোনো মডার্ন কবিই তাঁর মতো মডার্ন নন, তরুণও নন। বিংশ শতাব্দীর জ্ঞানপ্রবৃদ্ধ লোকও তাঁর সব মত বুঝি হজম করতে পারেন না। ওমর আজ জগতে অপরিমাণ শ্রদ্ধা পাচ্ছেন – তবু মনে হয়, আরো চার পাঁচ শতাব্দী পরে তিনি আরো বেশি শ্রদ্ধা পাবেন – যা পেয়েছেন তার বহু সহস্র গুণ।...
>
> আমাদের কাছে, বিংশ শতাব্দীর জ্ঞানবিজ্ঞানপুষ্ট কারণজিজ্ঞাসু মনের কাছে, ওমরের কবিতা যেন আমাদেরই প্রশ্ন, আমাদেরই প্রাণের কথা। আমরা জিজ্ঞাসা করি-করি করেও যেন সাহস ও প্রকাশক্ষমতার দৈন্যবশত তা জিজ্ঞাসা করতে পারছিলাম না। বিগত মহাযুদ্ধের মতোই আমাদের আজকের জীবন মহাযুদ্ধক্লান্ত অবিশ্বাসী-মন জিজ্ঞাসা করে ওঠে – কেন এই জীবন, মৃত্যুই বা কেন? স্বর্গ, নরক, ভগবান বলে সত্যই কি কিছু আছে? আমরা মরে কোথায় যাই? কেন এই হানাহানি? এই অভাব, দুঃখ, শোক – এমনিতর অগুণতি প্রশ্ন, যার উত্তর কেউ দিতে পারেনি।... এই চিরন্তন প্রশ্ন ওমরের জ্ঞানপ্রশান্ত মনে প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে ঝড়ের মতোই দোল দিয়েছিল। সেই তরঙ্গ-সংঘাতের সঙ্গীত, বিলাপ, গর্জন শুনতে পাই তাঁর রুবাইয়াতে। ওমরকে বিংশ শতাব্দীর মানুষের ভালো-লাগার কারণ এই। (কাজী নজরুল, ১৯৯৬/২: ১০৪-১০৫)

নজরুল যেমন প্রচলিত মতকে অনুসরণ করে ওমরকে আংশিক Epicurean বলে মেনে নিতে দ্বিধা করেননি, তেমনি ওমরকে সুফি শ্রেণিতে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে কিনা তা নিয়েও কিছুটা উদাসীন ছিলেন। ইরানের কবিদের মধ্যে সুফিবাদের প্রভাব কমবেশি ছিলই এবং শারাব-সাকিকে তারা মূলত রূপকার্থে ব্যবহার করে সাধনার পথকে গোপন রাখেন। ওমরের দার্শনিক তত্ত্ব নিয়ে নজরুলের মাথাব্যথা ছিল না, তিনি নিজেকে তত্ত্বজিজ্ঞাসু নয়, রস-পিপাসু বলে অভিহিত করে ওমরের কবিতা নিয়েই আনন্দে ছিলেন।

নজরুল দর্শন-তত্ত্ব নিয়ে আগ্রহী না হলেও প্রমথ চৌধুরী ওমরের দর্শন-চিন্তা উদঘাটনে সচেষ্ট হয়েছিলেন, কেননা তাঁর মতে, দর্শনের জমির উপরই তাঁর (ওমরের) কবিতার ফুল ফুটে উঠেছে (কান্তি, ১৯৯৫: ভূমিকা)। প্রমথ চৌধুরী ওমরকে Epicurean বলে মানতে দ্বিধান্বিত। Epicurean-রা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু নিয়ে ইন্দ্রিয়-সুখের চর্চা করে কিন্তু তারা ইন্দ্রিয় অর্থে বহিরিন্দ্রিয় ও মানসেন্দ্রিয় দুই বুঝতেন। তাঁরা ছিলেন শান্তিতে কিন্তু ওমরের হৃদয়-মন চির-অশান্ত। ওমর আবিষ্কার করেছেন যে, বিশ্বের অন্তর-বাহির দুই সমান অর্থহীন, মিথ্যা। তাঁর চোখে –

> ঊর্ধ্বে, অধে, ভিতর, বাহির
> দেখছ যা সব মিথ্যা, ফাঁক,
> ক্ষণিক এ সব – ছায়ার বাজী
> পুতুল-নাচের ব্যর্থ জাঁক; (কান্তি, ১৯৯৫: ২৪)

ওমরের মধ্যে তাই প্রমথ চৌধুরী নৈরাশ্যবাদিতার ছাপ খুঁজে পেয়েছেন।

সৈয়দ মুজতবা আলী ওমরের সুফি পরিচয় নিয়ে কিছুটা সন্দিহান ছিলেন। দরবেশ-সুফিরা কৃচ্ছ্রসাধনা এবং যোগচর্চা করতেন। তুর্কি-ইরানি সুফিদের মধ্যে নাচের সঙ্গে চিৎকার করে জিকির বা নাম-জপে ভাবে বিভোর বা অজ্ঞান হওয়া তাদের সাধনার অঙ্গ ছিল। ওমর সুফি-দরবেশদের এ ধরনের চর্চাকে পরিহাসের দৃষ্টিতে দেখেছেন। কান্তি ঘোষের অনূদিত ওমরের রুবাই (৫৫) থেকে এ ধারণার দৃষ্টান্ত দিয়েছেন তিনি:

দ্রাক্ষালতার শিকড় সেটী
তার না জানি কতই গুণ –
জড়িয়ে আছেন অস্থিতে মোর
দরবেশী ভাই যাই বলুন –
গগন-ভেদী চীৎকারে তাঁর
খুলবে নাকো মুক্তিদ্বার,
অস্থিতে এই মিলবে যে খোঁজ
সেই দুয়ারের কুঞ্চিকার! (কান্তি, ১৯৯৫: ২৮)

ওমরকে মুজতবা আলী অভিহিত করেছেন চার্বাকপন্থী[৫] বলে। চার্বাকরা কেবল প্রত্যক্ষকেই প্রমাণ বলে স্বীকার করেন; অনুমানভিত্তিক কোনো প্রমাণকেই প্রমাণ বলে স্বীকার করেন না। নীলিমা ইব্রাহিম অবশ্য সৈয়দ মুজতবা আলীকেই চার্বাকপন্থী বলে অভিহিত করেছেন। কেননা প্রত্যক্ষবাদীদের মতোই ছিল তাঁর আচরণ; ‘চেক ডিজঅনাডরড’ না হলে নাকি তাঁর লেখার মুড আসতো না (নীলিমা, ২০১৬: ৪৩)।

এটা সত্য যে, ওমরের মধ্যে প্রত্যক্ষবাদিতার সুর স্পষ্ট। জগৎ-সংসার নিয়ে তাঁর জিজ্ঞাসা ছিল, অনাস্থা ছিল, কিন্তু এপিকিউরিয়াস ও চার্বাকপন্থীদের মতো ঈশ্বরের অস্তিত্বে অবিশ্বাস বা নাস্তিকতা ছিল না। বরং শেষজীবনে ওমর ধর্মচর্চা করেছেন বলেই শোনা যায় বরকতুল্লাহ, ১৯৯৪: ৩৭)। তাঁর রুবাইয়ের কোনো কোনো স্থলে স্রষ্টার প্রতি নির্ভরতা প্রকাশ পেয়েছে; কাজী নজরুলের (১৯৮৯-৯০) অনুবাদে ১৩ সংখ্যক রুবাই:

স্রষ্টা যদি মত নিত মোর – আসতাম না প্রাণান্তেও,
এই ধরাতে এসে আবার যাবার ইচ্ছা নেই মোটেও।

১৫১ সংখ্যক রুবাইয়ে (কাজী নজরুল, ১৯৮৯-৯০) মানুষকে স্রষ্টার খেলার পুতুল বলে অভিহিত করা হয়েছে:

আসিনি ত হেথায় আমি আপন স্বাধীন ইচ্ছাতে,
যাবও না নিজ ইচ্ছামত, খেলার পুতুল তাঁর হাতে!

নজরুল তাঁর নিজ গানেও এ ভাবকে অনুসরণ করে রচনা করেছেন – ‘খেলিছ এ বিশ্ব লয়ে বিরাট শিশু আনমনে।’

অথবা ১৬১ সংখ্যক রুবাই (নজরুল, ১৯৮৯-৯০) উল্লেখ করা যায়:

আমরা দাবা খেলার ঘুঁটি, নাইরে এতে সন্দ নাই!
আসমানী সেই রাজ-দাবাড়ে চালায় যেমন চলছি তাই।

হজরতকে প্রশ্ন করার মধ্যেও ওমরের বিশ্বাসবোধেরই স্ফুরণ ঘটে। ১৯৬ সংখ্যক রুবাই (কাজী নজরুল, ১৯৮৯-৯০):

পৌঁছে দিও হজরতেরে খৈয়ামের হাজার সালাম,
শ্রদ্ধাভরে জিজ্ঞাসিও তাঁরে লয়ে আমার নাম –
"বাদশানবী! কাঁজি খেতে নাই ত নিষেধ শরিয়তে,
কি দোষ করল আঙুর পানি? করলে কেন তায় হারাম?"

হজরতের উত্তরকেও ওমর তাঁর মতো করে নির্মাণ করেছেন পরবর্তী রুবাইয়ে (কাজী নজরুল, ১৯৮৯-৯০):

তত্ত্ব-গুরু খৈয়ামেরে পৌঁছে দিও মোর আশিস
ওর মত লোক বুঝল কিনা উল্টো করে মোর হাদিস!
কোথায় আমি বলেছি যে, সবার তরেই মদ হারাম?
জ্ঞানীর তরে অমৃত এ, বোকার তরে উহাই বিষ!

হজরতকে মেনে নেয়ার মধ্যে ওমরের ধর্মবিশ্বাসের কিছু প্রমাণ অবশ্য পাওয়া যায়। তবে ওমরের মধ্যে বা তাঁর রুবাইয়াতে অংশত সুফিবাদ, চার্বাকদর্শন বা ভোগবাদ থাকলেও তিনি যে নাস্তিক ছিলেন না – তা জোর দিয়ে বলা যায়। মূলত ধর্ম-বিষয়ক দর্শনে তাঁর মধ্যে যে রহস্যময়তা রয়েছে, তা আসলে বিদ্রোহের স্পর্শে স্পর্ধিত। তিনি নিজেই নতুন এক মতবাদের উদগাতা। ওমরের সঙ্গে নজরুলের তাই সাযুজ্য পাওয়া যায় ধর্ম-দর্শনেও। নজরুল একাধারে হামদ-নাত লিখেছেন, অন্যদিকে রচনা করেছেন বহু সংখ্যক শ্যামা-সংগীত, হিন্দু-মুসলিম দুই ধর্মাবলম্বীর মিলনের কামনায় উভয় ধর্মের পুরাণ ও ঐতিহ্যকে মিলিয়ে দিয়েছেন কাব্যের আধারে। ব্যক্তিগত জীবনেও সংসার পেতেছেন ভিন্ন ধর্মাবলম্বী এক নারীর সঙ্গে; একই ছাদের তলে দুজনের ধর্মমতে কারো অশ্রদ্ধা প্রকাশ পায়নি। নজরুল স্রষ্টায় বিশ্বাসী বটে কিন্তু স্রষ্টার কোনো বিশেষরূপে নয়; স্রষ্টার সৃষ্টির মধ্যেই তিনি স্রষ্টাকে খুঁজে পেতে চেয়েছেন। আর তাই মানব-ধর্মকে সর্বোচ্চে ঠাঁই দিয়েছেন তিনি। ওমরের মতো নজরুলও জীবনবাদী; প্রবল জীবনবোধে উজ্জীবিত হয়ে প্রথাগত কূপমণ্ডূক ধর্মাচারকে উড়িয়ে দিয়ে তিনি মানুষের তথা জীবনের গান গেয়েছেন। সমকালে তাই ওমরের মতোই 'কাফের' আখ্যা দেয়া হয়েছে তাঁকে, ওমরের মতোই দুর্বোধ্য ছিলেন তিনি; প্রথাগত সমাজ-জীবনের গণ্ডিতে তাই তাঁকে খাপ খাওয়ানো যায়নি। ওমরের মতোই নজরুলকে নিয়ে তাই সমকালীন সাংস্কৃতিক, নান্দনিক, রাজনৈতিক পরিমণ্ডল হয়েছিল বিষম বিব্রত। প্রকৃতার্থে যুগের চাইতে আধুনিক ছিলেন তিনি ।

রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম রচনায় নজরুল সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছেন মূলকে অক্ষুণ্ন রাখতে। এ প্রসঙ্গে তাঁর নিজ বক্তব্য উদ্ধৃত করা সঙ্গত:

> আমি আমার ওস্তাদি দেখাবার জন্য ওমর খৈয়ামের ভাব ভাষা বা স্টাইলকে বিকৃত করিনি – অবশ্য আমার সাধ্যমত। এর জন্য আমার অজস্র পরিশ্রম করতে হয়েছে, বেগ পেতে হয়েছে। কাগজ-পেন্সিলের, যাকে বলে আদ্যশ্রাদ্ধ, তা-ই করে ছেড়েছি। ওমরের রুবাইয়াতের সবচেয়ে বড় জিনিস ওর প্রকাশের ভঙ্গি বা ঢং। ওমর আগাগোড়া মাতালের পোজ নিয়ে তাঁর রুবাইয়াৎ লিখে গেছেন – মাতালের মতোই ভাষা, ভাব, ভঙ্গি, শ্লেষ, রসিকতা, হাসি, কান্না –সব। কত বড়সর ধরে কত বিভিন্ন সময়ে তিনি এই কবিতাগুলি লিখেছেন, অথচ এর স্টাইল সম্বন্ধে কখনো এতটুকু চেতনা হারাননি। মনে হয় এক দিনে বসে লেখা। আমি আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি – ওমরের সেই ঢঙটির মর্যাদা রাখতে, তাঁর প্রকাশভঙ্গিকে যতটা পারি কায়দায় আনতে। কতদূর সফল হয়েছি, তা ফার্সি-নবিশরাই বলবেন। (কাজী নজরুল, ১৯৯৬/৩: ১০৫)

প্রায় অর্ধ-শতক পরে সত্যি ফার্সি ভাষায় পারদর্শী নুরুন নাহার বেগম নজরুলের রুবাইগুলোতে মূলের যে ব্যত্যয় ঘটেছে, তা নির্দেশ করেছেন। নুরুন নাহার বেগম তাঁর অনূদিত *রোবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম* গ্রন্থে ফিটজেরাল্ড, কান্তি ঘোষ ও নরেন্দ্রদেবের অনুবাদের তুলনামূলক আলোচনা প্রসঙ্গে মূল পাঠ থেকে তাদের বিচ্যুতিগুলো দেখিয়েছেন। তাঁর বিচারে নজরুল মূল ফার্সি থেকে অনুবাদ করেছেন বলে তাঁর অনুবাদে ভুল অপেক্ষাকৃত কম। তবে মূল শব্দ ও ভাষার আনুগত্য পুরোপুরি নেই নজরুলের অনুবাদে। তাঁর এই বক্তব্যের পক্ষে নজরুল অনূদিত ছয়টি রুবাই, মূল ফার্সি (বাংলা হরফে লেখা), এগুলোর গদ্যানুবাদ এবং নজরুলের অনুবাদ পাশাপাশি রেখে দেখিয়েছেন কোথায় কোথায় নজরুল মূল পাঠ থেকে দূরে সরে গেছেন। উদাহরণ হিসেবে নজরুল অনূদিত ৪০ সংখ্যক রুবাইয়ের উল্লেখ করেছেন নুরুন নাহার:

> আয্ দরসে জুমলে জুমলে বগ্‌রিযি বেহ্
> ওআন্দর সর জুলফে দিলবর আওরিযি বেহ
> যান্ পিশ্ কেহ্ রুজগার খুনত্ রিযদ্
> তু খুন কনিনে দর্ কদেহ্ রিযি বেহ্

গদ্য অনুবাদ:

> যদি জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চা থেকে নিজেকে তুমি দূরে সরিয়ে রাখতে পার, তাহলে তা হবে সর্বোৎকৃষ্ট। যদি প্রিয়ার কেশের বেণীর ফাঁদে নিজেকে বেঁধে ফেল তাহলে সেটা হবে সর্বশ্রেষ্ঠ। যদি মৃত্যুর দ্বারে পৌঁছানোর আগে দ্রাক্ষারক্ত দ্বারা পেয়ালা পূর্ণ করতে পার তাহলে তা হবে সর্বোত্তম।।

নজরুল ইসলামের অনুবাদ:

> ছেড়ে দে তুই নীরস বাজে দর্শন শাস্ত্রপাঠ,
> তার চেয়ে তুই দর্শন কর প্রিয়ার বিনোদ বেণীর ঠাট্

ঐ সোরাহির হৃদয়-রুধির নিষ্কাশিয়া পাত্রে ঢাল্,
কে জানে তোর রুধির পিয়ে কখন মৃত্যু হয় লোপাট॥

সমালোচকের মতে, এ অনুবাদের শেষোক্ত দুটি লাইন মূলের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। (নুরুন, ১৯৯২: ৫২)

প্রকৃতার্থে এ অনুবাদটি ভাবানুবাদ এবং মূলের নির্যাস এতে সম্পূর্ণই রয়েছে। অনুবাদ করতে গিয়ে নজরুল ওমরের শব্দগত বিন্যাস এবং উপমাকে রেখায় রেখায় অনুসরণ করেননি। প্রত্যেক কবির চিত্রকল্প ভিন্ন কিন্তু ভিন্ন হলেই আলাদা হয় না। ওমরের চিত্রকল্পের সৌন্দর্য নজরুলের মনে যে ভাবে ধরা দিয়েছে, সেই ভাব থেকে নতুন উপমা, চিত্রকল্প বা শব্দবন্ধ তৈরি করেছেন নজরুল। তাঁর মতো কবি-প্রতিভার ক্ষেত্রে তা খুবই স্বাভাবিক ও সহজাত ।

এ কবিতায় বরং নজরুল ওমরের ছন্দ এবং ভঙ্গিটুকু যথাযথ রেখেছেন এবং শব্দ ব্যবহারেও অসাধারণ সৌকর্যের পরিচয় দিয়েছেন। মূল রুবাইয়ের ককখক ছন্দবিন্যাস অক্ষুণ্ণ রেখেছেন অসাধারণ দক্ষতায় এবং শব্দ-ব্যবহারেও ওমরের মাতাল ভঙ্গির স্ফূর্তিতে কবিতার চরণে নিয়ে এসেছেন।

নজরুল প্রথম জীবনে হাফিজ-সমুদ্রে অবগাহন করেছেন এবং পরিণত-জীবনে ভাব-ভাষা ও মানসে একাত্ম হয়েছেন ওমরের সঙ্গে। সৌন্দর্য-সৃষ্টি এবং প্রেম ও বিদ্রোহের চেতনায় নজরুল একাত্ম হয়েছেন পারস্যের এই কবিদ্বয়ের সঙ্গে। পারস্য যেমন একাধিকবার গ্রিকদের সঙ্গে সংঘর্ষে কখনো পরাজিত এবং কখনও জয়ী হয়েছে এবং একসময় মিশর, প্যালেস্টাইন অধিকার করেছে, এমনকি গ্রিসে পর্যন্ত হানা দিয়েছে। কিন্তু পরবর্তীসময়ে আরবদের কাছে পরাজিত হয়ে নিজ ভূমি, ভাষা, স্বকীয়তা সবই একে একে হারিয়ে ফেলেছিল কিন্তু রক্তের মধ্যকার বিদ্রোহের চেতনাকে হারায়নি। আরবি রাজভাষা হবার প্রায় চারশ বছর পর মহাকবি ফিরদৌসীর *শাহনামা* রচিত হয় ফার্সিতে নতুন জাতিগত চেতনায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে পারসিয়ানরা। ওমর এবং হাফিজ দুজনই রাজভাষার বদলে মাতৃভাষায় কাব্য রচনা করে যে বিদ্রোহী মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন, তা নজরুলের মধ্যে পাওয়া যায় আরও আগ্রাসী ভঙ্গিতে। নজরুল সমকালীন ঔপনিবেশিক শাসকের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করে কারাবরণ পর্যন্ত করেছেন। ‘বিদ্রোহী’ কবিতার মধ্য দিয়ে বিদ্রোহের আগুনকে ছড়িয়ে দিয়েছেন সাধারণ মানুষের মধ্যে।

অনুবাদে ফার্সি কাব্যকে গ্রহণ করার মধ্যেও নজরুলের বিদ্রোহীচেতনা ক্রিয়াশীল ছিল। সমগ্র বাংলা সাহিত্য যখন নতজানু হয়ে দুহাত ভরে নিয়েছে ইংরেজি ও অন্যান্য ইউরোপীয় সাহিত্য থেকে, নজরুল তখন আলোকসম্পাত করেছেন প্রাচ্যকেই। মোহিতলাল মজুমদার যখন তাঁকে শেলি, কিটস, টেনিসন, ওয়ার্ডসওয়ার্থের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে চাইলেন, তখন নজরুল ব্রিটিশ কবিদের অসহ্য মনে করে প্রত্যাখ্যান করেন (যদিও এদের কাব্যের সঙ্গে তার পরিচয় ছিল না, এমন নয়; শেলির কবিতা তিনি অনুবাদও করেছেন

কিন্তু আপ্লুত হননি)। ফার্সি এবং আরবি থেকে মূলত অনুবাদ করেছেন তিনি, যদিও ইংরেজি ভাষা একবারে অনধিকারে ছিল না তাঁর।

পারস্যের কবিরা বিশেষত হাফিজ ও ওমর যেমন নিজ সময়ের অন্ধ রীতিনীতিকে পাশ কাটিয়ে আলোকের সন্ধানে ব্যাপৃত থেকেছেন, নজরুলও তেমনি নিজ কাল বা জনমত নয়, নিজের মনের আলোকে পৃথিবী দেখার চেষ্টা করেছেন। পারস্যের কবিদের ভাবাদর্শের সঙ্গে একাত্মবোধকে লক্ষ করে সৈয়দ মুজতবা আলী নজরুলের দ্বিতীয় মাতৃভূমি হিসেবে পারস্য বা ইরানকে অভিহিত করেছেন। এবং নজরুলের অনুবাদকে 'সকল অনুবাদের কাজী' বলে অভিহিত করেছেন।

নজরুলের মতো সৃষ্টিশীল প্রতিভার ক্ষেত্রে অনুবাদ আবশ্যিক ছিল না। আরবি-ফার্সি কাব্যানুবাদ ছাড়াও কবিখ্যাতি পেতে তাঁর নিজস্ব রচনা অপ্রতুল ছিল না। লক্ষণীয় যে, প্রথম জীবনে বিচ্ছিন্নভাবে হাফিজ-রুমী-ওমর অনুবাদ করলেও কাব্যাকারে যখন তিনি *রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ* (১৯৩০) এবং *রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম* (১৯৫৯) রচনা করেছেন যখন কবি এবং সংগীতজ্ঞ হিসেবে রীতিমতো প্রতিষ্ঠিত। এসময়ে এসে এই কাব্যানুবাদের পেছনে একাধিক কারণ হতে পারে।

প্রথমত, নজরুল-মানসে নজরুলের বিদ্রোহী চেতনার উন্মেষ ও প্রকাশে এই কবিদ্বয়ের যে প্রভাব তাকে অস্বীকার না করে বরং তাকে প্রতিষ্ঠিত করতে তিনি এ গ্রন্থগুলো রচনা করেছেন। যদিও তিনি কৈফিয়ত দিয়েছেন যে, প্রকাশকের জোর তাগিদ ছিল। কিন্তু কবির পূর্ব-সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতেই এ তাগিদ এসেছে তা অনুমান করা অসঙ্গত হবে না।

দ্বিতীয়ত, পুত্রের রোগশয্যায় বসে তিনি রচনা করেছেন হাফিজের রুবাইয়াৎ এবং পুত্র-বিয়োগের ব্যথায় উদ্‌ভ্রান্ত ছিলেন যখন তখন ওমরের রুবাইয়াৎ অনুবাদ করেন ধারাবাহিকভাবে। কবি তাঁর মানসিক অস্থিতিশীল অবস্থায় এ কবিদ্বয়ের কাছে থেকে মানসিক শক্তি ধার করতে চেয়েছিলেন কি? বিশেষত ওমরের অধ্যাত্ম-চিন্তা বা জগৎ-জীবন সম্পর্কিত জিজ্ঞাসা এবং জীবনবাদী মনোভাবের আশ্রয়ের ছায়ায় নিজেকে সমর্পিত করতে চেয়েছেন?

তৃতীয়ত, ব্রিটিশ রাজ্যে বাস করে, ব্রিটিশ ভাবাদর্শের সাহিত্যিক পরিমণ্ডলে নিশ্বাস ফেলে নজরুল প্রাচ্যকে তুলে ধরার বিদ্রোহী চেতনায় প্রাচ্যের কবিদের অনুবাদে প্রবৃত্ত হয়েছেন এ ধারণা নতুন নয় এবং অমূলকও নয়।

নজরুল তাঁর সমগ্র কর্ম, সত্তা, অবয়বে যে বিদ্রোহের স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে ছিলেন ঔপনিবেশিক শাসকের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বিপ্লবের আহবান জানিয়েছিলেন – সেই সত্যের সঙ্গে মিলিয়ে নজরুলের ফার্সি কাব্যানুবাদকে দেখার চেষ্টা তাঁর সাহিত্যিক সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে নতুন পালক যোগ না করলেও প্রতিরোধ-প্রতিবাদের ইতিহাসে নিঃসন্দেহে উচ্চস্বরে উচ্চারিত হবে। প্রাচ্যকে সমুন্নত করার সদিচ্ছা এবং আন্তরিকতাও নজরুলকে নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখার ক্ষেত্র বিস্তৃত করবে।

টীকা

১. আধুনিককালের ইরান দেশটি ১৯৩৫ সাল অবধি পশ্চিম তথা সারা বিশ্বে 'পারসিয়া' বা 'পারস্য' নামে পরিচিত ছিল। এ রচনায় ইরান এবং পারস্য উভয় নামই ব্যবহৃত হয়েছে।

২. প্রায় ছয়শ (৬৩৪) বছরের রাজভাষা ছিল ফারসি। ইংরেজরা ১৮৩৭ সালে রাজভাষা ফারসির বদলে ইংরেজি নির্ধারণ করেন। কিন্তু তখনও আদালতে ফারসি ব্যবহৃত হতো। প্রমাণ হিসেবে বলা যায় যে, মুনতাসীর মামুনের *ঢাকা : ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ দলিলপত্র* গ্রন্থে ফারসি থেকে অধ্যাপক আবদুস সাইদ অনূদিত বিদ্রোহী সিপাহিদের একটি মামলার বিবরণীর সারসংক্ষেপ তুলে ধরা হয়। ঘটনার তারিখ ২২ নভেম্বর ১৮৫৭। এই মামলার রায়ও দেয়া হয় ফারসিতে ১ ডিসেম্বর ১৮৫৭ সালে। (এম এ মোমেন, 'উপমহাদেশে পারস্যের প্রভাব', বণিকবার্তা, মে ১১, ২০২৩)

৩. তাঁর (বজলে করিম) আরবি ফারসি উর্দু ভাষায় বিলক্ষণ অধিকার ছিল (অরুণকুমার, ২০১৯: ১০) ।

৪. হাফিজের একটি দীওয়ানের অংশ:

বা মায় ছাজ্জাদা রঙ্গীন কোন
গারাৎ পীরে মোগাঁ গোইয়াদ
কে ছালেক বেখবর না বুয়াদ
যে রাহ ও রেছমে মনজেলহা। (কাজী নজরুল, ১৯৯৬/৩: ৭৮)

অর্থাৎ, পির যদি বলেন, জায়নামাজ মদিরসিক্ত করিতে কুণ্ঠিত হইও না। কেননা পথ ও পথের রেওয়াজ সম্বন্ধে তিনি অনবধান নহেন। (বরকতউল্লাহ, ১৯৯৪: ৭৮)

৫. 'চার্বাকগণ বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিলেন। স্থুল চার্বাকগণের মতে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব নাই; পরলোক, পুনর্জন্ম বা জন্মান্তর বলিয়াও কিছু নাই। কার্যকারণসম্বন্ধ এবং কর্মফলও স্বীকৃত হইতে পারে না। ঐহিক, দৈহিক ও ক্ষণিক সুখই স্বর্গ, কন্টকাদিব্যথাজনিত দুঃখই নরক, দেহচ্ছেদেই মুক্তি। ইহাদিগকে উচ্ছেদবাদী, দেহাত্মবাদী এবং ধূর্তচার্বাকও বলা হইয়া থাকে। ইহারাই সর্বজনপরিচিত ও বহুনিন্দিত চার্বাক সম্প্রদায়।' (দক্ষিণারঞ্জন, ১৯৯৯: মুখবন্ধ)

গ্রন্থপঞ্জি

অরুণকুমার বসু, ২০১৯। *নজরুল জীবনী,* আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা।
আহমদ শরীফ, ১৯৬৯। *বাঙলার সূফী সাহিত্য,* বাংলা একাডেমি, ঢাকা।
কাজী নজরুল ইসলাম, ১৯৮৯-৯০। *রোবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম,* প্রকাশক: শ্রীরবীন্দ্রনাথ বসু, কলকাতা।
কাজী নজরুল ইসলাম, ১৯৯৬। আবদুল কাদির সম্পাদিত *নজরুল রচনাবলী* ১, ২, ৩, ৪, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।
কান্তিচন্দ্র ঘোষ, ১৯৯৫। *রোবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী, ১৯৯৯। *চার্বাক দর্শন*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা।
নীলিমা ইব্রাহীম, ২০১৬। 'ওমর খৈয়ামের জীবনদর্শন ও নজরুল-মানস', বিশ্বজিৎ ঘোষ সম্পাদিত *আজ সৃষ্টি সুখের উল্লাসে* (প্রথম খণ্ড), কথাপ্রকাশ, ঢাকা।
মলয় রায়চৌধুরী, ২০১৬। *রচনাসংগ্রহ* ১, গাঙচিল, কলকাতা।
মুহম্মদ এনামুল হক, ১৯৯১। মনসুর মুসা সম্পাদিত *মুহম্মদ এনামুল হক রচনাবলী* প্রথম খণ্ড, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।
মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ, ১৯৯৪। *পারস্যপ্রতিভা*, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র, ঢাকা।
মোহাম্মদ আজম, ২০২০। *কবি ও কবিতার সন্ধানে*, কবিতাভবন, ঢাকা ।
শামসুল আলম সাঈদ, ২০০৯। *বাংলায় খৈয়াম ও নজরুল অনুবাদ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।
সালাউদ্দীন আইয়ুব, ১৯৯৭। *নজরুল-সাহিত্যের নন্দনতাত্ত্বিক বিচার*, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা।